বৈঠকি

ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

দেশে দেশে মোর ডিশ আছে □ ৯
দুশো চল্লিশ টাকায় তেত্রিশশো মাইল □ ১৫
কে আগে? □ ২৮
সত্তরটি মাত্র শেলীর কবিতা সম্পূর্ণ নিজের □ ৩৩
চপকাটলেট ও বাঙালির সংস্কৃতি □ ৩৬
রানির ভাষাকে আমরা নিজের করে নিয়েছি □ ৪১
সুদূরের কবলে আড়াই দিন □ ৪৮
বর্ষশেষ ও নববর্ষ □ ৫৫
দিবারাত্রির কাব্য ঃ দিনরাতের একদিনের ক্রিকেট □ ৫৮
গ্রীষ্মের সন্ধানে □ ৬১
ফাতনা রহস্য □ ৬৫
তিরাশির চক্কর □ ৬৮
কাঁঠাল বলে কথা □ ৮২
এক শীতে স্পেন □ ৮৫

দেশে দেশে মোর ডিশ আছে

আমরা যখন বি. এ. ক্লাসে পড়ি তখন প্রথম বাজারে এল এলিয়টের নোটস টুয়ার্ডস দ্য ডেফিনিশন অব কালচার। ততে রন্ধনকলা (কুইজিন) সাংস্কৃতিক মানের একটি সূচক বলে স্বীকৃত। এলিয়টের সাহিত্যসমালোচনায় যতই ফাঁকফোকর থাক, সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর ধ্যানধারণা যতই অস্বচ্ছ হোক, এই খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা, আমার মতে সাহেব ঠিকই ধরেছিলেন। কিছু গুণ তো থাকবেই, নইলে শেষজীবনে যে ও এম (অর্ডার অব মেরিট) পেলেন তা কি অমনি-অমনিই?

স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও অন্যান্য চারুশিল্পের মতো রন্ধনকলাও রসিকের কাছে বিভিন্ন সংস্কৃতির পরিচায়ক। এ সম্বন্ধে ক্রমেই লোকের চেতনা বাড়ছে। তাই শহরাঞ্চলে 'এথ্‌নিক' রেস্তরাঁর সংখ্যা বাড়ছেই। ১৯৬২ সালে লন্ডন শহরেই ৪০০র বেশি ভারতীয়/পাকিস্তানি রেস্তরাঁ ছিল, না জানি এখন তার সংখ্যা কত। ছোটোবেলায় কলকাতায় দুটি মাত্র চীনে খাবারের জায়গা আমরা দেখেছি; নানকিং আর চাংওয়া। তারও আগে ক্যান্টন বলে নাকি চীনেপাড়ায় আর একটি খাবার জায়গা ছিল, কিন্তু সেটা আমি দেখিনি।

আজ তো চীনে রেস্তরাঁ পাড়ায়-পাড়ায়, অলিতেগলিতে, ফুটপাতে, ম্যাগির প্যাকেট ঘরে ঘরে। ট্যাংরার চীনে খাবারের জায়গার হদিশ না জানলে সাংস্কৃতিক অবজ্ঞার পাত্র হতে পারেন। ভিন্ন সংস্কৃতির মিলনের চিহ্ন 'মোগলাই চাউমিয়েন' ও 'ট্যাংরা-টাইপ' চীনে খাবারের বিজ্ঞাপন দেখে আশ্বস্ত ও আহ্লাদিত হই। এভাবেই শক হুণ দল পাঠান মোগল একদেহে লীন হয়ে মহাভারত তৈরি হয়েছে।

খাদ্যচর্চা ও রন্ধনকলার সন্ধান শুধু একধরনের পরিচিত খাদ্যের স্বাদে নিবদ্ধ রাখলে বা খুঁজলে স্বাদের নবনব দিগন্ত কোনও দিনই নাগালে আসবে না। শুধু রাসবিহারী অ্যাভিনিউ বা চৌরঙ্গির প্রশস্ত সড়কে ঘুরলেই যেমন কলকাতার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য জানা যায় না, তার জন্য যেতে হয় চীনেপাড়ায়, নাখোদা মসজিদের আশপাশের গলিতে, পোস্তায়, পাথুরিয়াঘাটা, নিমতলায়, তেমনি রকমারি স্বাদ সন্ধানের অভিযান বিরিয়ানি, চাপ, চাউমিন, চপ্‌সুয়ে, সর্ষেবাটা বা ভাপেসেদ্ধ ইলিশের রাজপথে আবদ্ধ রাখলে, স্বাদের অলিগলি, শুঁড়িপথের হদিস না জানলে, কৌতূহল বিশ্বব্যাপী না হলে, স্বাদের মনমাতানো বৈচিত্র্য অনেকটাই অজ্ঞাত থেকে যাবে।

ঔদরিকতা ও খাদ্যবিলাস ঠিক এক জিনিস নয়। আমার দেখা খাদ্যবিলাসী বা 'গুরমে'-দের মধ্যে—দেশি খাবারে, বিদেশি খাবার অন্য জিনিস—এখনও আমার কাছে বাবার (স্বর্গত) বড়োমামাই সর্বাগ্রগণ্য। বাড়ির সবার কাছে 'বাবুকর্তা'; আমাদের 'বড়োদাদু'। আমিও ৯-১০ বছর বয়স পর্যন্ত বাবার মামাবাড়িতেই মানুষ। তখন মৈমনসিংহ সদর থেকে—বড়োদাদু নবাবী নাম 'নসিরাবাদ'-ই বলতেন—এগারো মাইল দূর সেই গ্রামে তরিতরকারি সব ঋতুতে সহজলভ্য ছিল না। তা ছাড়া পাঁউরুটি, কেক ইত্যাদিও মৈমনসিংহ শহরে ভালো পাওয়া যেত না। এসব নিয়মিত সরবরাহের জন্য কলকাতায় একজন কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর কাজ রোজ পার্সেল ট্রেনে টাটকা তরিতরকারি, ফল, পাঁউরুটি, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি কিনে পাঠনো। হান্টলি পামারের বিস্কুটের চৌকো ও গোল টিনের সঙ্গে সেই যে প্রথম প্রণয় তা এখনও ভুলতে পারিনি। পরে বিলেতে গিয়ে এসব বিস্কুট আর খুঁজেই পেলাম না। সাম্রাজ্য হারালে কি সবই যায়?

আম বস্তুটি এক বিশেষ চর্চার বিষয় ছিল। ঝুড়িঝুড়ি আম কলকাতা থেকে আসত। তার জন্য একটা আলাদা আমের ঘরই ছিল। তাতে লম্বা লম্বা দড়িবোনা তাক, যাতে শক্ত কাঠে শুয়ে আমদের গায়ে আঘাত না লাগে, এবং চারদিকে হাওয়া খেলতে পারায় আম সমানভাবে 'তৈরি' হবার সুযোগ পায়। রোজ আবার সাজানো আমদের তাদের দড়ির বিছানায় পাশ ফিরিয়ে, ঘুরিয়ে শোয়াতে হত, না হলে সমানভাবে আম 'তৈরি' হবে কী করে? এ কাজ বাড়ির মহিলারা নিজেদের জিম্মাতেই রাখতেন, ঠাকুর-চাকরের হাতে ছাড়ার জিনিস এ নয়। আম খাবার জন্য বিশেষ পাত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল ঃ একটা স্যুপ প্লেটের মধ্যে পাত দিয়ে খোপ করা, এক-এক খোপে এক-এক জাতের আমের টুকরো, এক বাসনে মিশে সব একাকার না হয়ে যায়। খাবার সময় বলে দিতে হত, কোনটা কী জাতের আম, ক্ষেত্রবিশেষে কোন বাগানের, এমনকি কোন গাছের। তখনও স্টেনলেস স্টিলের বঁটি বা ছুরির প্রচলন হয়নি। লোহার ছুরিতে আম কাটা নিষিদ্ধ, বিশেষত ল্যাংড়া। কারণ ল্যাংড়ার রসে লোহার ছোঁয়ায় আম কালো হয়ে যাবে। ল্যাংড়া আম কাটতে হতো বিশেষ ভাবে তৈরি বাঁশের ছুরিতে। বাদুড়ের মাংস খাওয়া চলে কীনা এ নিয়ে একবার প্রচুর বিতর্ক হলো। প্রচলিত বিশ্বাস, বাদুড় মাথা নিচে করে গাছে ঝোলে। তাহলে নিশ্চয়ই মুখ দিয়ে মলত্যাগ করে। এরকম নোংরা জীবের মাংস খাবার প্রশ্ন ওঠেনা। দাওার এনে মৃত বাদুড়ের দেহ ব্যবচ্ছেদ করে দেখা গেল এটা একেবারেই ভুল ধারণা। বরং বলা চলে বাদুড়ের মত মাংস হয় না, কারণ এত পরিস্কার খাদ্যাভ্যাস অনেক পাখিরই নেই। যেমন মুরগি তো ময়লা ঠুকরে পোকা খেয়ে বেড়ায়। বাদুড় গাছপাকা ফলটি ছাড়া কিছুই খায়না। এরপর বাড়িতে চলল শিকার করে বাদুড় খাবার ধুম। (রেণুকাদেবী চৌধুরাণী তাঁর 'রকমারি নিরামিষ রান্না'য় প্রকাশক সুবর্ণরেখা), কিন্তু ছাপতে দেবার আগে আমি

বলায় এটা বাদ দেন। আমার মনে হয়েছিল কলকাতার পাঠকের কাছে ব্যাপারটা অরুচিকর ঠেকতে পারে। পরে বুঝলাম, এ আশঙ্কা অমূলক। আমাদের এক বন্ধুকে (বইপাড়ায় বিশেষ পরিচিত প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা) কিঞ্চিৎ দ্রবীভূত অবস্থায় 'গাবখাওয়া' বাদুড়ের মাংসের জন্য বহুবার হা-হুতাশ করতে শুনেছি। এঁর বাড়ি বীরভূম জেলায়।

খাওয়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কিছু বিপদও আছে। সব জিনিস একটু চেখে দেখার প্রবণতা আমার মধ্যে প্রবল। আমি যদিও বলি, আমি খাদ্যের জগতে ইউলিসিসের মতো নিত্যনতুন অভিজ্ঞতার সন্ধানে সতত সঞ্চারী, আমার অনেক বন্ধুর মতে এ আমার এক ধরনের অপোগণ্ডতা (ইনফ্যান্টিলিজম্) ছাড়া কিছু নয়, যা দেখি সেটাই মুখে পোরার চেষ্টা।

'কালামারি' (স্কুইড)—খুদে অক্টোপাসের মতো দেখতে হলেও অক্টোপাস নয়, 'শম্বুক জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণী', আমার এক প্রিয় খাদ্য। প্রথম যখন ইতালিতে আমার স্ত্রীকে 'কালামারি অল ফরনো' খাওয়ালাম, বলিনি জিনিসটা কী। খেয়ে তিনি মুগ্ধ। কিন্তু বস্তুটি কী বলামাত্র পুরোটা তৎক্ষণাৎ বের করে দিলেন। কালামারিতে জিভ পাকিয়ে নতুন অভিজ্ঞতার সন্ধানে একটু বেশি দুঃসাহসিক হয়ে পড়েছিলাম। স্পেনে শীতকালে সামুদ্রিক খাদ্যের সমাহার অতি চিত্তচমৎকারী। বারগুলির দীর্ঘ কাউন্টার-এ বিচিত্র সব সামুদ্রিক মাছ, বিরাট বিরাট চিংড়ি, ঝিনুক ইত্যাদি থরে থরে সাজানো। যেমনটি চান, করে দেবে। একটা বার-এ ঢুকে দেখি সুন্দর একটা পাত্রে মাঝারি আকৃতির একটা অক্টোপাস সাজানো আছে। ভাষা জানি না, আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, ওটা খাব, ভেজে দিলে বা আভেন-এ রান্না করে দিলে ভালো হয়। বারের পিছনের ছোকরাটি তৎক্ষণাৎ একটা বাটি এনে কচকচ করে অক্টোপাসের একটা 'পা' বা কর্ষিকা চাকাচাকা করে কেটে তাতে ফেলল। আমি ভাবলাম এবার বুঝি কালামারির মতো রান্না করতে নিয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় কী? কাঁচা সেই টুকরোগুলিতে অলিভ অয়েল ও নানারকম ড্রেসিং ও কাঁচা সবজির টুকরো ছিটিয়ে, নিপুণভাবে প্রায় নৃত্যের ভঙ্গিতে, বাটিতে টুকরোগুলি নাচিয়ে ('টস' করে) আমার সামনে ধরে দিল। আমার তো চক্ষুস্থির। কাঁচা অক্টোপাসের সালাদ! কর্ষিকার টুকরোগুলিতে তখন 'সাকার'-বাটিগুলি লেগে রয়েছে, এ খাব কী করে? গা গুলোতে লাগল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও মুখরক্ষা করতে কয়েকটা টুকরো কোনওরকমে গিলতেই হল। সেও এক শিক্ষা। কিন্তু স্বভাব না যায় মলে। বহু পরে তাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরে স্থানীয় ও জাপানি কায়দায় প্রস্তুত বিখ্যাত কাঁচামাছের পদ চেখে দেখার লোভ সামলাতে পারিনি। ভালোই লেগেছিল, কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। অবশ্যই সঙ্গে 'সাকে' থাকায় কিছুটা সাহায্য হয়েছিল। স্পেনেই আর একবার অজানা খাবার ফরমাশ করে বিপদে পড়েছিলাম। স্পেনের গ্যাস্ট্রনমিক গাইড-এ এক রান্নার নাম দেখলাম—বোধহয়

'তাফাদা', নামটা ঠিক আর মনে নেই—সেটা নাকি স্পেনের রন্ধনকলার চূড়ান্ত নিদর্শন। স্পেনে গেলে 'পায়েল্লা' (আরবি রান্নার স্পেনীয় রূপ, আমাদের 'পোলাও' একই সূত্র থেকে এসেছে) বা 'গেস্‌পাচো' স্যুপ তো সবাই খায়। ঠিক করলাম, 'তাফাদা'-টা একবার চেখে দেখতে হবে, একটা নতুন কিছু। যখন পদটি টেবিলে এল তখনও ঠিক বুঝতে পারিনি। হলদেটে কী একটা, তার উপর আড়াআড়ি করে রাখা আছে সরু, সাদা, লম্বা, ফ্র্যাঙ্কফার্টার সসেজের আকৃতির দুটি জিনিস। সোজা আভেন থেকে এসেছে। খেতে গিয়ে দেখলাম পিছল পিছল, ভালো লাগছে না। আবার বইটা বার করে বিশদ পড়ে দেখি, নীচের জিনিসটা শুওরের বাঁট (সাউজ আডার) এবং উপরের সাদা জিনিস দুটি 'ট্রাইপ' (গবাদি পশুর অন্ত্র)। ..নিই পিছলে জিনিস মোটেই ভালোবাসি না, যেমন ঢ্যাঁড়শ সেদ্ধ; বিশদ বিবরণ পড়ার পর টেবিল ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচি।

অজানার সন্ধানে আর একবার অন্য ধরণের বিপদে পড়েছিলাম। ফরাসি দেশে তুর-এ ট্রেন বদলে আঁজু যাব। তুর-এ সামান্যই সময়, অথচ খিদে পেয়েছে খুব। রেস্তরাঁয় পোয়াসঁ-র (মাছ) তালিকা থেকে 'মুল মারিনিয়ের' ফরমাশ করলাম। মাংসের দাম অত্যাধিক। এই পদটা দেখলাম দামেও সুবিধা। এল বড়ো বাটি ভর্তি মাখন আর রসুনে ভাপানো গুনে গুনে ৭৪টি খোলাসহ কুচি ঝিনুক (পেরিউইংক্‌ল্‌)। প্রতিটি আলাদা করে খুলে শাঁস বের করে, মখন ও রসুনের সস্‌-এ ডুবিয়ে খেতে হবে। অমার সহধর্মিণী খোলা খুলতে সাহায্যের হাত বাড়ালেও ট্রেনটা ফেল করে দু' ঘন্টার উপর স্টেশনে বসে থাকতে হল। 'অয়েস্টার ও নাতুরাল' (কাঁচা ঝিনুক) এখনও আমার এক প্রিয় খাদ্য। শীতকালে ইউরোপের রাস্তাঘাটে, বার-এ, রেস্তরাঁয় বিক্রি হয়। যে মাসের বানানে 'আর' অক্ষর নেই সে মাসে খাওয়া নিষিদ্ধ, অর্থাৎ গরমে খাওয়া চলবে না, বোধ হয় বিষক্রিয়ার ভয়ে। রেস্তরাঁ বা বারে গোটা ছয়েক আধখোলা অবস্থায় একটা ডিশে সামনে এনে দেবে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে খেলে সামনেই ছুরি দিয়ে ফাটিয়ে খোলা বইয়ের মতো খুলে এগিয়ে দেবে। তাতে একটু ভিনিগার ও পছন্দ হলে ক'ফোঁটা ট্যাবাস্কো সস্‌ দিয়ে টুক্‌ করে সোজা খেয়ে নেওয়া। রান্নাবান্নার ঝামেলা নেই—এটাই 'অয়েস্টার ও নাতুরাল'। এক বিশেষ জাতের সামুদ্রিক ঝিনুকই এভাবে খাওয়া হয় এবং ফরাসি দেশের ব্রিটানি উপকূলের ঝিনুকই খাদ্যহিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য। আমাদের গোপালপুর-অন্‌-সিতে একবার এ জাতের ঝিনুক পেয়ে হাঁড়ি ভরে কলকাতায় এনেছিলাম। একটু আঁশটে গন্ধ থাকায় 'ও নাতুরাল' খাওয়া গেল না, কিন্তু ওমলেটে অপূর্ব। অজানাকে জানার দুর্মর অভিলাষ একবার আমাকে হাতির মাংসের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। আফ্রিকার শিকারের বইতে হাতির মাংসকে ভক্ষ্য করে তোলার নানা পদ্ধতি দেওয়া আছে। বিখ্যাত শিকারি জন টেলর ('পণ্ডোরো' নামে খ্যাত) লিখেছেন, হাতির মাংস মাটিতে পুঁতে তার উপর উনুন বানিয়ে কাঠের আগুনে

যথারীতি দিন তিনেক অন্যান্য রান্না করার পর মাটি খুঁড়ে পাওয়া যাবে সুস্বাদু, নরম হাতির মাংসের রোস্ট। গারো পাহাড়ে হাতি শিকারের সময় একবার মনে হল, এটা পরখ করে দেখাই যাক। আমার নির্দেশ শুনে কলকাতা থেকে আনা আমার রান্নার লোকটির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। নেহাত পালাবার পথ নেই বলেই বোধহয় রাজি হল। তিনদিন পর উনুন খুঁড়ে যে পোড়া মাংস পিণ্ড বের হল তা দেখে আমারই খাবার প্রবৃত্তি হল না। আমার রান্নার লোকটি শুঁকে বলল, পচে গেছে। ভাবখানা-পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে, এখন কোনও রকমে নিষ্কৃতি পেলে ভালো। আমারও তখন কেমন লাগছে। বললাম, একটা কুকুরকে দিয়ে দেখ তো, খায় কি না! একটু বাদে সানন্দে সে খবর দিল, কুত্তায় ও খেল না। ফেলে দিতে বললাম তখন। সারা ক্যাম্পে স্বস্তি ফিরে এল। এরপর সাহেবী কেতা পরিহার করে টাটকা হাতির মাংসের কোর্মা লুচি দিয়ে খাবার চেষ্টা করেছি। মাংসে কোনো গন্ধ নেই, তবে কেমন যেন কচ্‌কচে। হয়তো ঠিক জায়গার মাংসটা বেছে নিতে পারিনি। মিজো ও নাগাদের কাছে হাতির মাংস প্রিয়তম খাদ্য। ১৯৬০ সালেই আইজলে শুখানো হাতির মাংস পাঁচ টাকা সের দরে বিক্রি হত। আজ মিজোরাম-বা নাগাল্যান্ডের জঙ্গলে হাতি নেই বললেই চলে। সব রান্না হয়ে গেছে।

এবার একটা ধ্রুপদী রান্নার বর্ণনা দিয়ে এই সমালোচনার ইতি টানছি। লন্ডনে সিম্পসন অন্ দি স্ট্র্যান্ড নামক রেস্তরাঁ প্রায় তিনশ বছর ধরে চলছে। আমি প্রথমে বোধহয় প্রিস্ট্‌লি-র একটা উপন্যাসে এর সম্বন্ধে পড়ি। ব্রিটিশ বিফ রোস্ট আর তার ঐতিহ্যিক অঙ্গাঙ্গী অনুপান ইয়র্কশায়ার পুডিং-এর (পুডিং বললেও আসলে ময়দার তৈরি নোন্‌তা, সেঁকা বা বেক করা আস্‌কে পিঠের মতো একটা জিনিস) পীঠস্থান। দুটি তলায় চার খানা ঘর নিয়ে এই রেস্তরাঁ-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক 'সিটি'-র বড়ো সাহেবরা এবং কিছু খাদ্যরসিক। এক তলার একটি ঘরেই মাত্র মহিলাদের প্রবেশাধিকার। অন্যত্র শুধু পিন্ স্ট্রাইপ্‌ড্ ট্রাউজারস্ এবং কাল কোট। আর তারই মধ্যে ছড়ানো কিছু 'কাউন্টি'-মার্কা টুইড্। এক কথায় ইংরেজি রক্ষণশীলতার দুর্গ। রোস্ট বিফ এল এক বিশাল অষ্টাদশ শতাব্দীর কারুকার্যময় রুপোর ঠেলায়, পুরো আধখানা ষাঁড় তাতে শোয়ানো, নীচে আগুন জ্বলছে। ঠেলে আনল দুজন, আর তারাই পরিবেশক। তখন তাদের সঙ্গে আলোচনা ঃ কোন কাট্টা পছন্দ করব ঃ সিনা গলা, রাং বা অন্যকিছু; কেমন রান্না, অর্থাৎ 'রেয়ার' কম অগ্নিপক্ক, কিন্তু সবচেয়ে নরম, অনেক সময় ছুরি দিয়ে কাটলে রক্তবিন্দু দেখা যায়, খাদ্যরসিকের লজ্জে কিছুতেই একে 'আন্ডার ডান' বলা চলবে না, বলতে হবে 'রেয়ার' (যদিও অভিধানে 'রেয়ার'-এর অর্থ 'আন্ডার' ডান দেওয়া আছে) না মিডিয়াম,' না 'ওয়েল ডান'। ভালো রোস্টের গোড়ার কথা, মাংসের টুকরোটা বড়ো হওয়া চাই, না হলে রোস্ট হয় শুক্‌নো নয় বেশি অপক্ক থাকবে, ঠিক তেমনটি হবে না। কাজেই পারলে একটা পুরো ষাঁড় একসঙ্গে ঘুরিয়ে